Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.105-113
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে জীবনজিজ্ঞাসা ও আত্মপ্রত্যয়

ডঃ কৃষ্ণ ধীবর

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, রামপুরহাট, বীরভূম, ভারত

Abstract:

In the pages of literature, various experiences of life are captured and on the other hand, solutions to overcome various problems of life are also found. The writer paints a full picture of a perfect life in literature at his own creation. Kalidasa worshiped Satya, Shiva and Sundar. So, he saw life in terms of perfection. In the drama Shakuntalam, Kalidasa gave simple answers to various questions of our life and gave various moral lessons in the life. At the very beginning of the play he teaches us to bow to an invisible force. That energy drives our lives. With that power, we move forward on the path of happiness. Kalidasa realizes the true value of life through morality and spiritual education in every scene of his drama.

In the fourth act of the drama, when Shakuntala is cursed, Priyambada is at Durvasa's feet to appease his anger. It is not only love for friend but moral philosophy of our life. Every man's life is covered with deep sorrow, in which sorrow we sink momentarily. By plunging into the sorrow we seek to discover the wisdom of Rasa. This sense of humour is consciousness in the midst of confusion. But in order to find joy in this disparity, separation is necessary. In Kalidasa's poetry, that separation has been normalized. Kalidasa brings a lot of sorrow into the lives of Dushyanta and Shakuntala, de-taints their lives and instils deep faith in life.

Keywords: Literature, Kalidasa, wisdom of Rasa Satya Shiva and Sundar, Spiritual education, sorrow erc.

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"[1]

[1] সঞ্চয়িতা, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-২২।

জীবনের এই খেলাঘরে অনুভূতির কুচি দিয়ে জন্ম হয় রঙবেরঙের উপলব্ধির, সেই উপলব্ধির নানা উৎসেচক হৃদয়ের শততন্ত্রীতে নব রসায়নের জন্ম দেয়। আর সেই নব রসায়নের আত্মিক প্রকাশই হল সাহিত্য। সাহিত্য কথা বলে জীবনের বুলিতেই, তাই সাহিত্য ও জীবন মাখামাখি হয়ে থাকে কাগজকুচির পাতায় পাতায়। জীবনের যা কিছু সংশয়, যা কিছু আবদার, আবেগ তা যেমন সাহিত্যের সাদা ফলকে জীবন্ত হয়ে ওঠে তেমনি জীবনজিজ্ঞাসা থেকে উত্তরণের আত্মপ্রত্যয় মিশেল হয়ে থাকে সাহিত্যরসের পরোতে পরোতে, শব্দমালার ক্যানভাসে। সেই ক্যানভাস ছাপিয়ে সাহিত্যিক অনুভব করেন "না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ"। সেই জাগরিত প্রাণের ভাণ্ডার পূর্ণতা পায় সাহিত্যিকের "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্"[2] এহেন জবানবন্দীতে। কালিদাস শকুন্তলায় একদিকে যেমন শকুন্তলার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন তেমনি জীবনের যা কিছু চাওয়া পাওয়া, যা কিছু অপূর্ণতা তা আত্মপ্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন, এখানেই কবি সার্থক।

শকুন্তলা শুধু নাটক নয়, জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা মূল্যবান উপলব্ধির ফসল। নাটকের প্রতিটি চরিত্র যেন আমাদের জীবনের খন্ড খন্ড অনুভবের কথা বলে। শকুন্তলার জীবনের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের জীবনজিজ্ঞাসা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। শকুন্তলা নাটকে অনুভূতির ভরা জোয়ারে সাঁতার কাটা আমাদের মতো বোধবুদ্ধিহীন সাঁতারুর পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও আকাশের কোণে যেমন খণ্ডাংশ দৃষ্টিগোচর হয় তেমনই শকুন্তলা নাটকের অনুভূতিকে মনের ঘরে বসিয়ে যুক্তির আতিথ্যেতার পিজমে বিশ্লেষণ করলে এই নাটক যেন জীবনদর্শন।

শকুন্তলার জীবনদর্শনঃ একটি পরিপূর্ণ জীবন খন্ডতায় পূর্ণতা পায় না পূর্ণতা পায় অখন্ডতায়, যে অখণ্ডতায় সুখ দুঃখ একাকার হয়ে যায়। দুঃখের অতলস্পর্শ সমুদ্রেও জীব সুখের মুক্ত খুঁজে পায়, জীবন সার্থক হয়। গীতাকার প্রকৃত জীবনের মূল্য উপলব্ধি করে বলেছেন-"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।"[3] অর্থাৎ যিনি দু:খে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখে বিগতস্পৃহ, তিনিই পরিপূর্ণ মনুষ্যপদবাচ্য। কালিদাস সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী, জীবনকে খন্ডতার মধ্যে তিনি দেখেননি। তাই যখনই দুষ্যন্ত শকুন্তলা সমাজ ভুলে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, অথবা মন যখন অন্যখানে তখনই অভিশাপ নেমে এসেছে- "আঃ অতিথিপরিভাবিনি,

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।"[4]

অর্থাৎ উন্মাদ যেমন আগের কথা স্মরণ করতে পারে না শকুন্তলা যার কথা ভেবে অতিথি অবমাননা করেছে অন্য কেও মনে করিয়ে দিলেও সে তাকে চিনতে পারবে না। আমাদের মনে হতে পারে শান্ত ও স্নিগ্ধ

[2] অভিজ্ঞান-শকুন্তলম-৫/২, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-৩০৯।

[3] শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সাংখ্যযোগ-২/৫৬, পৃষ্ঠা-৬৭।

[4] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম-৪/১, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২৩৬।

প্রেমকাহিনীতে কেনই বা এই অগ্নিসম অভিশাপ? এই অভিশাপ দুষ্যন্তের জন্য, এই অভিশাপ শকুন্তলার জন্য। প্রথম তিনটি অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমকাহিনী খাদযুক্ত, তাই কালিদাস বুঝিয়েছেন প্রেম জীবনের একটি অংশ হতে পারে কিন্তু প্রেম সমগ্র জীবন নয়, প্রেম ছাড়াও জীবন দায়িত্বকর্তব্যে ভরপুর। যে দায়িত্ব কর্তব্য থেকে কয়েক মাইল দূরে দুষ্যন্ত শকুন্তলা। তাই অভিশাপের আগুনে পুড়িয়ে দুষ্যন্ত শকুন্তলার জীবনকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করেছেন নাট্যকার। জীবনতৃষ্ণাকে জীবনপুরের পথিকের মতো ভোগ করতে শিখিয়েছেন কালিদাস। কালিদাসের এই উপলব্ধি জীবনে নতুন আত্মপ্রত্যয়ের স্বাদ দিয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে যতদিনই বাঁচুক না কেন এই আত্মপ্রত্যয় তাকে শেখাবে জীবনে কোন কিছুই সর্বোচ্চ নয়, প্রেম যদি জীবনের লালিত অনুভূতি হয় তবে দায়িত্ব-কর্তব্য সেই অনুভূতিরই আর এক রূপ। আবার জীবনের যা কিছু জিজ্ঞাসা কালিদাস তাকে নিঙড়ে জীবনকে আত্মপ্রত্যয়ের আস্বাদ দিয়েছেন। একদিকে জীবনের জিজ্ঞাসা অন্যদিকে আত্মপ্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে শকুন্তলা হয়ে উঠেছে অনন্যা, এক পরিপূর্ণ জীবনদর্শন।

দুঃখের রূপসাগরে সাঁতার দিয়েই সুখের মুক্ত অন্বেষণ করতে হয়, যে দুঃখ আমাদের পরম আত্মীয়, তাই সেই দুঃখের ঘরের ঘরণী হয়ে কবির অনুভূতি:

"দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে"[5]

কালিদাস সেই অনুভূতির জীবন্ত শরিক, সেই শরিকানা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন দুষ্যন্ত শকুন্তলার জীবন কাহিনীতে, তাদের অনুভূতির চোরাবালিতে, তাদের হৃদয়ের উপলব্ধিতে। সেই উপলব্ধির পূর্ণ মালিকানায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে' লিখছেন-"কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন; বাহির হইতে তাহাকে ছাই চাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষ অগ্নি সৎকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে।"[6]

নৈতিকতার আলোয় শকুন্তলাঃ শৃঙ্খলা জীবনকে যতোটা আস্তেপিষ্ট বেঁধে রাখে, বিশৃঙ্খলা ততোটাই জীবনকে আলগা করে দেয়, বিশৃঙ্খলতার কারাগার থেকে শৃঙ্খলার স্রোতে জীবনকে ভাসিয়ে দেওয়ার মূল চাবিকাঠি হল নৈতিকতা, নৈতিকতা জীবনকে পূর্ণতা দান করে। শকুন্তলা নাটকের ব্রাহ্মমুহূর্তেই নাট্যকার এক অদৃশ্য শক্তির কাছে দর্শককে মাথানত করতে শিখিয়েছেন:

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥"[7]

সৃষ্টির আড়ালে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিয়ে কালিদাস যেন নৈতিকতার সহজপাঠটিকে আত্মস্থ করিয়াছেন আমাদের মনের সুষম্মাতে। আমরা কেও নাস্তিক হতে পারি, অথবা কেও ঈশ্বর স্বীকার করতে নাও পারি।

[5] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূজা পর্যায়, ২০৪ সংখ্যক, পৃষ্ঠা-৯১।

[6] প্রাচীন সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৪৯

[7] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম, -১/১, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১

কিন্তু এই জগত ও জীবনের আড়ালে এক অদৃশ্য শক্তিকে আমাদের প্রত্যেকে স্বীকার করতেই হবে। He is the Supreme Power of the world and our life. সেই অদৃশ্য শক্তি প্রতিমুহূর্তে আমাদের নৈতিকতার পাঠ দান করছে। যখনই আমরা অনৈতিক কাজে উৎসুক হয় তখনই সেই অদৃশ্য শক্তি আমাদের বাধা দেয়। মনের নানাবিধ দ্বন্দ্বের পর আমরা সেই শক্তির কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়, নৈতিকতার জয় হয়। শকুন্তলা নাটকের মঙ্গলাচরণে এক অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে কালিদাস যেন অজান্তেই এক অদৃশ্য শক্তির কাছে আমাদেরকে মাথানত করতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আবার নাটকের সভাপূজাতে নটী সূত্রধারের উপস্থাপনার প্রশংসা করলে সূত্রধার বলে ওঠেন:

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্
বদবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।"[8]

অর্থাৎ পন্ডিত ব্যক্তিদের তুষ্টি বিধান না হওয়া পর্যন্ত আমার অভিনয় নৈপুন্য যথাযথ হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি এই সহমর্মিতা নৈতিকতার আর এক নিদর্শন। এই সহমর্মিতা ছড়িয়ে পড়েছে বৈখানসের "ন খলু ন খলু বাণ: সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্"[9] উক্তিতে। তবে হরিণ শিশুর প্রতি এই উক্তিতে নাট্যকার অন্য ইঙ্গিতও দিয়েছেন। শকুন্তলার সঙ্গে মৃগশিশুর তুলনা, আগুনে যেমন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় তেমনি শকুন্তলারূপ তুলোয় দুষ্যন্তের কামবাণ বর্ষিত হবে, হে, দর্শককুল তোমরা যেন মানসিক প্রস্তুতি রেখো। দর্শককে আগামবার্তা দিয়ে নৈতিকতার আর এক অধ্যায় চয়ন করিয়েছেন কালিদাস।

নাটকের প্রথম অঙ্কে গাছে জল দেওয়ার সময় তার ভিতর থেকে ভ্রমর বেরিয়ে শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করলে রাজার আত্মপ্রকাশ ঘটে। দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালনকর্তা রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে শুধু ভ্রমরের হাত থেকে বাঁচালেন তাই নয় সাবলীল ভঙ্গিতে গভীর নৈতিকতার পরিচয় দিলেন। এই নৈতিকতার আড়ালে ফল্গুধারার ন্যায় জীবনের চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। দুষ্যন্ত শকুন্তলার উষ্ণপ্রেম গাঁথুনিতে দর্শক যখন মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছে, তখন দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মানসিক আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলতে হস্তীবৃত্তান্তের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। এইভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে জীবনকে কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। সহজলভ্য বস্তু চিরস্থায়ী হয় না, তাই শকুন্তলা নাটকের সমালোচকদের অনুভূতি– "ক্ষনিকের মোহে যা কিছু পাওয়া যায় অবহেলার খলিত মুষ্টি থেকে তা খসে পড়ে কিন্তু যা দুর্মূল্য, চিরস্থায়ী তা চোখের জলের মূল্যে কিনতে হয়।"[10]

চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রিয়ংবদা পায়ে ধরে দুর্বাসার ক্রোধ প্রশমন করলেন। এই শুধু সখীর প্রতি গভীর ভালোবাসাই নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, স্বার্থপরতা, হিংসা, ভোগ থেকে জীবনলক্ষ্যে উত্তরণের মূলমন্ত্র। সেই মূলমন্ত্রে কণ্ব শকুন্তলাকে দীক্ষিত করেছেন তার একাধিক নৈতিক উপদেশের মধ্য দিয়ে। কখনও তিনি উপদেশ দিয়েছেন:

"অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে

[8] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম, -১/২, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১২

[9] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম, -১/১০, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-৪০

[10] **শকুন্তলাতত্ত্ব, চন্দ্রনাথ বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো**

বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি।"[11]

আবার কখনও লৌকিক উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন:

"শুশ্রূষস্ব গুরুন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ "[12]

এ শুধু উপদেশ নয়, হৃদয় সরোবরের চিরসত্য বাণী, যে বাণীতে দীক্ষিত হয়ে আমরা অনুভব করতে পারি- "আমারই চেতনা রঙে পান্না হল সবুজ চুনী উঠল রাঙা হয়ে।"[13]

শকুন্তলার আনন্দচেতনাঃ জীবনের আর এক সাধনা হল আনন্দবোধ, আনন্দ থেকেই জীবনের শুরু হয় এবং আনন্দেই জীবনের শেষ। আনন্দেই জীবন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। তাই আনন্দবোধকে জীবনের রসদ করতে পারলেই "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়"। কালিদাস আনন্দবাদী কবি, তাই "জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান"[14] জীবনের আনন্দবোধ কাব্যতত্ত্বের পরোতে পরোতে মিশিয়ে দিয়েছেন। সেই আনন্দরস যেমন ছড়িয়ে পড়েছে দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমভাবনায়, তেমনই আনন্দরসে ভরপুর করে দেখেছেন অনসূয়া প্রিয়ংবদার মানবিকতা ও বিবেকবোধকে। দুর্বাসা অভিশাপ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় প্রিয়ংবদা বলেছেন- "ভগবন্, প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপ: প্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতা এক অপরাধ: মর্ষিতব্য।"[15] প্রিয়ংবদার অনুনয় শুনে দুর্বাসা মুনি বলেছেন- "অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যতে" অনসূয়া প্রিয়ংবদা স্বস্তি পেলেন, এই স্বস্তি আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, কবির ভাষায়-"আনন্দের মধ্যে সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে; কালিদাস তাহার কাব্যের রস প্রবাহকে সেই স্বর্গমর্তব্যাপী সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া তাহাকে মহান পরিণাম দান করিয়াছেন।"[16]

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদুষকের সঙ্গে রাজার আলাপচারিতায় মনে আনন্দের পাপড়ি খুলতে থাকে। 'বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকারী' বিদুষকের অঙ্গভঙ্গী, মৃগয়ায় না যাওয়ার অজুহাতে একাধিক হাস্যরসের পরিবেশন পাঠককুলকে আনন্দে মশগুল করে তোলে। মৃগয়া না যাওয়ার অজুহাতে রাজার রসিকতায় বিদূষক যখন বলেছে –"ভো বয়স্য যদ্ বেতস: কুজ্বলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিং আত্মন: প্রভাবেণ,

---

[11] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম-৪/১৯, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২৯৩ ।

[12] অভিজ্ঞান-শকুন্তলম-৪/১৮, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২৯০।

[13] সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ:-৭।

[14] চৈতালি কাব্যগ্রন্থ, কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[15] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২৩৮।

[16] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-২৭।

ননু নদীবেগস্য।"[17] উক্তিতে দর্শক শুধু আনন্দের খোরাক পেয়েছে তাই নয়,বিদূষকের মৃগয়ার অনুৎসাহের কৌশলে রসবোধ উপভোগ করেছেন, এই রসবোধই যেন শকুন্তলা নাটকের প্রাণভোমর।

তৃতীয় অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলার শৃঙ্গার আনন্দের আর এক রূপ। সেখানে শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের অনুভব-"তোমার কথা আমি জানি না, কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর যেদিন তোমাতে মন সঁপেছি সেদিন থেকেই মদন আমায় কষ্ট দিচ্ছে।" শকুন্তলা নখের চিহ্নতে পদ্মপত্রে প্রেমপত্র প্রেরণ করেছে প্রেমিকের কাছে। তবে তাদের ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় কালিদাস প্রেমের একাংশ পূর্ণ করেছেন। তবে এ প্রেমিকাহিনী পূর্ণতা পায়নি, ভাবজগতে যতক্ষণ না দুর্বাসার অভিশাপে দুটি হৃদয় খাঁটি সোনার রূপান্তরিত হয়েছে। আবার আমরা লক্ষ্য করি সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলা ও ভরতের মিলনের অন্তরালে নাট্যকার জীবনের আনন্দকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাই গ্যেটে লিখেছেন- "কেউ যদি তরুণ বয়সের ফুল এবং পরিণতি বয়সের ফল কেউ যদি মরতো স্বর্গ একত্রে দেখিতে চান তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"[18]

তবে এই আনন্দবোধ শুধু নাটকের চেতন চরিত্রে ছড়িয়ে পড়েছে তাই নয়,অসচেতন প্রকৃতির মধ্যেও আনন্দবোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন কালিদাস। প্রথম অঙ্কে প্রকৃতি যেন রাজরানী সাজে সজ্জিত:

"সুভগসলিলাবগাহা: পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতা:
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসা: পরিণামরমণীয়া:।"[19]

আবার নটির গানে কোথাও প্রকৃতি পাগলপারা:

"ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈ: সুকুমারকেশরশিখানি
অবতংসয়ন্তি দয়মানা: প্রমদা: শিরীষকুসুমানি।"[20]

প্রকৃতির বৈচিত্রতা যেন জীবন সরোবরের মুক্তের সন্ধান দেয়। রূপ রস গন্ধে ভরা প্রকৃতিকে ভোগ করেই জীবনের আত্মতৃপ্তি গড়ে ওঠে:

"এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছো"

তবে মনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক চিরকালের-"নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম, বাহুতে বাহুতে ধরিয়া।" মনোব্যথায় বিপন্ন রাজা বসন্ত উৎসবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, সেখানে প্রকৃতি বিবর্ণা। আবার এই প্রকৃতির কোলেই নাটকের নায়ক নায়িকার মিলন। সবমিলিয়ে প্রকৃতির আনন্দবোধ মানুষের রসতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করেছে আর কালিদাস সেই রসবোধকে আমাদের শিরায় শিরায় মিশিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ অঙ্কে প্রকৃতি কথা বলে যেন অন্তরকে ভরিয়ে দিয়েছে। শকুন্তলা বিদায়ের অনুভূতিতে কণ্বের অনুভূতি:

---

[17] অভিজ্ঞান -শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১২২।

[18] প্রাচীন সাহিত্য,শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৩৩।

[19] অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২০।

[20] অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-২২।

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।"[21]

পরক্ষণেই কোকিলের কুহুরবে প্রকৃতি শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমুতি দিয়েছে। শকুন্তলার বিদায়কালে ক্ষৌমবস্ত্র দান করে প্রকৃতি যেন ঋণমুক্ত হয়েছে। কালিদাস আনন্দ আর প্রকৃতিকে একাকার করে দিয়েছেন তার অনুভবে। তাই আনন্দ যদি খুঁজতে হয় তবে প্রকৃতির কোলে। সমুদ্রে বা পাহাড়ে একা দাঁড়িয়ে এত আনন্দ বোধ হয় তার কারণ আমরা যেন আমাদের পরম আত্মীয়ের সন্ধান পাই। পাহাড়ের বিশালতা আর সমুদ্রে গভীরতায় আমরা মিশে যাই প্রকৃতির বাতাবরণে।

শকুন্তলায় বিরহে অধ্যাত্মচেতনাঃ প্রত্যেক মানুষের জীবন অতলস্পর্শ বিরহে আচ্ছাদিত, সেই বিরহ সমুদ্রে আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে ডুবে যায়। সেই বিরহের সাগরে ডুব দিয়ে রসবোধ আবিষ্কার করতে চাই আমরা। বিরহের মধ্যে এই রসবোধ হল অধ্যাত্মচেতনা। তবে এই বিরহকে ভোগ করতে হলে অথবা বিরহের মধ্যে 'মা নিষাদ' উপলব্ধি করতে হলে বিচ্ছেদের প্রয়োজন। কালিদাসের কাব্যসাধনায় সেই বিচ্ছেদ স্বাভাবিক নিয়মে আবর্তিত হয়েছে। সে মেঘদূত হোক বা শকুন্তলা যখনই নায়ক নায়িকা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে তখনই অগ্নিপুষ্পের মতো অভিশাপ নেমে এসেছে। এই অভিশাপের শিখর অতি গভীর। পঞ্চম অঙ্কে প্রত্যাখ্যান তারপর সন্তান সম্ভাবা অবস্থায় মারিচাশ্রম দুঃখের আগুনে পুড়ে শকুন্তলা "বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবণি" আর নায়ক শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পর বারবার অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। এ যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। দুঃখের মধ্য দিয়ে অভিশাপের মধ্য দিয়ে পরম সত্যে উপনীত হওয়াই অধ্যাত্মচেতনা আর এই অধ্যাত্মচেতনা শকুন্তলার বিরহ ভাবনায় পূষ্টিলাভ করেছে আর মনের গোপন কোণে তা লালিত হয়ে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' রূপ অনুভূতি লাভ করেছে।

কালিদাস মানব জীবনকে পূর্ণতার অভিমুখেই কল্পনা করেছেন জীবনভর। ভগবান মানুষের সেই পূর্ণতার যাত্রাপথে সমস্ত উপহার বিলিয়ে দিয়েছেন। দেহ দিয়েছেন, মন দিয়েছেন, দিয়েছেন ইন্দ্রিয়, বিবেক, বুদ্ধি আবার অধ্যাত্মচেতনাও দিয়েছেন তিনি। তবে মানুষ অধ্যাত্মচেতনার দীপ্তিকে সবসময় অনুভব করতে পারে না। এই অনুভবের পথে প্রধান বাধা হল দেহ মন ইন্দ্রিয়। দেহকে অতিক্রম করতে না পারলে বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না, তখন অধ্যাত্মচেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর দেহকে অতিক্রম করতে পারলেই বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। কালিদাস দু:খভোগের মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করেছেন। অভিশাপ যেন দেহজ প্রেমকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। দুষ্যন্ত শকুন্তলা উভয়েই উপলব্ধি করেছে পরস্পরের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বকে ভোগ করতে হলে "সকলের তরে সকলে আমরা"উপলব্ধিতে স্নাত হতে হবে। এই চরম অনুভবে দুষ্যন্ত শকুন্তলা নায়ক নায়িকা পদে আসীন আর কালিদাস মহানায়ক।

[21] অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ৪/৯, পৃষ্ঠা-২৭১।

আলোচনার শেষে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের মতো বোধ বুদ্ধিহীন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটু দীর্ঘ আলোচনার একটি বক্তব্য বিষয় থাকে। শকুন্তলার ছত্রে ছত্রে শুধু প্রেমকাহিনী নয় জীবনদর্শন উঁকি দিয়েছে। শকুন্তলার চরিত্রগুলো শুধু চরিত্র নয় আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত হওয়া অনুভব। জীবনের পথে হোঁচট খেতে খেতে দুষ্যন্ত শকুন্তলার দেহজ প্রেম অধ্যাত্মপ্রেমে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জীবনজিজ্ঞাসা থেকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে শিখিয়েছেন কালিদাস। সভ্যতার বিবর্তনে পৃথিবীতে হয়ত অনেক কবি জন্মগ্রহণ করবেন, হয়ত পৃথিবীর বুকে অনেক কাব্য জন্ম নেবে কিন্তু শকুন্তলার মতো প্রাণোজ্জ্বল কাব্য আর কালিদাসের মতো প্রাণবাদী কবি আবার জন্ম নেবেন কিনা আমার জানা নেই। যে কাব্যসুষমায় ও জীবনজিজ্ঞাসায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটক আবর্তিত হয়েছে, যে রসনীলিমায় কাব্যের কথা রঞ্জিত হয়েছে, যে নাটকীয়তায় নাটক বেড়ে উঠেছে তা দুর্লভ। তাই এই আশা রেখেই শেষ করব যে, নতুন কোনো কিংবদন্তীকে অন্তরালে নতুন কোনো উজ্জয়িনীর বুকে কালিদাস আবার জন্মগ্রহণ করুন যেখানে রেবা শ্রিপ্রা নদীর অচেনা স্রোতও তাকে চিনে ফেলবে নতুন কোনো দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমকাহিনী সাক্ষী রাখতে। তবে আশা রেখেও সেই চির আক্ষেপ দিয়ে সমাপ্ত করলাম:

"আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ-
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী-কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ অধিরাজ।"[22]

গ্রন্থপঞ্জি:

আকরগ্রন্থ:

[22] চৈতালি, কালিদাসের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকর।

1) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, অর্থদ্যোতনিকা টীকা, সম্বন্বিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল(পঞ্চম সংস্করণ), ২০০৪।
2) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, প্রণব কুমার দত্ত(সম্পাদক) সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল: ২০০৬।
3) গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল (পুনর্মুদ্রণ) ১৪২১।
4) প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৪১১।
5) মেঘদুত পরিচয়, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (সম্পাদক) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল:১৪২২।
6) শ্রীমদ্ভবদগীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল (ত্রিংশতিতম সংস্করণ)-২০০৩।
7) গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল:১৩১৭।
8) সঞ্চিয়তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল (পুনর্মুদ্রণ)-২০০৩।
9) সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যম্, প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল (দ্বিতীয়সংস্করণ) ১৪০৯।
10) সাহিত্যদর্পণ(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল:১৯৯৮।
11) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা প্রকাশকাল (পুণর্মুদ্রণ) ১৪১৮।

আলোচনামূলক গ্রন্থঃ

1) চাকী, জ্যোতিভূষণ, কালিদাস সমগ্র নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল:২০০০
2) বসু, চন্দ্রনাথ, শকুন্তলা তত্ত্ব, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকাল:২০০৫
3) বাগচী, দীপক, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, প্রকাশকাল (পুণর্মুদ্রণ):২০২০
4) সেন, প্রবোধচন্দ্র, ভারতাত্মা কবি কালিদাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশকাল(প্রথম সংস্করণ):১৯৯৬
5) ভট্টাচার্য সুখময়, সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ):১৯৯১
6) নাথানন্দ, রঙ্গ, ভারতীয় দৃষ্টিতে নারী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, প্রকাশকাল (পুণর্মুদ্রণ):২০০৬
7) নন্দীর সুধীর কুমার, নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রকাশকাল (সংস্করণ):২০১৩